প্রথম অধ্যায়

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ১৯ শতকের বাংলায় নারী ক্ষমতায়ন

- প্রক্রিয়ার সূচনা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ১৯ শতকের নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতন্ত্র এই শব্দবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। বর্তমান সময়ে আমরা একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সুসভ্য মানুষ বলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পরিচয় দিতে অহংকার বোধ করি। কিন্তু প্রশ্ন এসে যায় যে এই শতকেও কেন আমরা নারীকে নিয়ে আলোচনা করব, যখন উনিশ শতককে নারীর সার্বিক উত্থানের সময় বলা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায় যে এই সময়টাই দাবি করছে এই রকম একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। তাহলে প্রশ্ন আসে আধিপত্যটা কার উপর? পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের সূত্রে এই শব্দটির বিস্তার ও ব্যাপকতা বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়, সমাজ-কাঠামোর বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে। আধিপত্য শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটো দিক উঠে আসে, একটি হল আধিপত্যকারী শ্রেণী এবং তার বিপরীতে অবস্থান করছে যার উপর আধিপত্য বিস্তার করা হয় অর্থাৎ আধিপত্যাধীন শ্রেনী। শক্তিশালী শ্রেণীই চিরটাকাল ধরে দুর্বল শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে শোষণের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে একটা সময় সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে যায়। মানব-সভ্যতা উদ্ভবের সময় তো আর 'নারী' 'পুরুষ' এই বিষয়টি নিয়ে এত মাথা-ব্যথা ছিল না। এরপর সভ্যতা বিকাশের সূত্র ধরে অর্থাৎ কৃষি বিস্তারের সূত্রে নারীকে করা হল ঘরবন্দি। যেহেতু সন্তান ধারণের ক্ষমতা শুধুমাত্র নারীর পক্ষেই সম্ভব, তাই সন্তান ধারণের সময় উপস্থিত হলে নারীর বিশ্রামের প্রয়োজন অতি আবশ্যক, যেহেতু প্রাক্‌গর্ভ ধারণ সময় থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত এমন কি সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হল। তাই বাইরের খবর রাখার সময় আর নারীর হাতে থাকল না স্বাভাবিক ভাবে। আর এই সুযোগটাকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে নির্মিত হল নতুন একটি সমাজ-কাঠামো যে কাঠামোটাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি পুরুষশাসিত সমাজ-কাঠামো বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো বলে।

এই পুরুষতন্ত্রই নারীরক্ষমতা হীনতার বড় কারণ। নারী কি জন্মসূত্রেই ক্ষমতা হীন, না তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়। প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক সর্বত্রই নারীর অবস্থা একই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় নারী পুরুষের বিভাজন রেখা একেবারে শিশুর জন্মের পর, লিঙ্গগত ভিন্নতা দিয়েই শুরু হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পুরুষ-নির্মিত সমাজ লিঙ্গ-বিভাজনের বিভিন্ন উপকরণ দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাকে নারী করে তোলে এবং শ্মশানে অথবা কবরে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা জারী রাখে পিতৃতন্ত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় বংশ নির্ধারিত হচ্ছে পিতা, স্বামী, পুত্রের পরিচয়ে। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে সে থাকে পিতার অধীনে, যৌবনে বিয়ের পর স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধকালে নারী থাকে পুত্রের অধীনে। নারী নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে না এই একবিংশ শতকেও। পরিবার-প্রধানের অর্থাৎ পুরুষের পরিচয়ে সমাজে-পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে নারী সদস্যরা পরিচিত হন। অমুকের মেয়ে, অমুকের মা, অমুকের বউ হিসেবে গড়ে ওঠে তার পরিচয়। পুরুষতন্ত্র এমন একটি তন্ত্র যেখানে পরিবারের মূল পুরুষটি পরিবারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। পুরুষতন্ত্রের কারণেই পরিবারের কন্যা বঞ্চনার শিকার হয়, পুত্র জন্ম থেকেই সমাদৃত হয়। ভবিষ্যতে এই ছেলেটি শৈশব থেকে ধীরে ধীরে পুরুষতন্ত্রের ধারক এবং বাহক হিসেবে সমাজে স্থান পায়। নারী-পুরুষের বৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমেই নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয় এবং নারী ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। নারীও বংশানুক্রমে পুরুষতন্ত্রকে আত্তীকরণ করতে বাধ্য হয়।

বর্তমান সময় বিজ্ঞানের সময়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার দৌলতে আমরা গর্ভাবস্থাতেই বুঝতে পারি যে গর্ভে ছেলে আছে না মেয়ে আছে। এবং যতই সরকারি ভাবে কন্যা ভ্রুণ-হত্যা বন্ধ হোক না কেন গোপন পথেও এ জঘন্য কর্ম সম্পাদন করেন অনেক তথাকথিত শিক্ষিত পিতামাতা। ছেলে মেয়ের জন্মের পর যখন একটু একটু করে বড় হয় সে, তখন মা বাবা সচেতন ভাবে এবং অনেক সময় অসচেতন ভাবে ছেলে মেয়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেন। ছেলে হলে তার খেলার সামগ্রী হিসাবে দেওয়া হয় ব্যাটবল, খেলার বন্দুক, সাইকেল আর রান্নাবাটির সামগ্রী, পুতুল তুলে দেওয়া হয় মেয়েদের হাতে। আর্থিক ভাবে মধ্যবিত্ত পরিবার হলেও পড়াশোনার ক্ষেত্রেও বৈষম্য দাঁড় করানো হয়। ছেলে সন্তানটিকে দেওয়া হয় কোনো প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে, আর মেয়ে সন্তানটিকে ভর্তি করা হয়

কোনো সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলে। এটা আবার সব পরিবারে প্রযোজ্য না হলেও বেশীর ভাগ পরিবারে এ চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রতিটি সমাজের ক্ষেত্রেই জেন্ডার ইস্যু সম্বন্ধে এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এই জেন্ডার আদর্শ দ্বারা নারী পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এবং সমাজ-জীবনে মেয়ে ছেলের উভয়ের কর্মক্ষেত্র নির্ণিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মতো একটি পুরুষশাসিত সমাজের জেন্ডার আদর্শ অনুযায়ী পুরুষের কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে এবং নারীর কর্মক্ষেত্র পরিবারের অন্তঃপুরে পরিচর্যা করার মধ্যেই সীমিত থাকে। এ চিত্র গ্রাম শহর সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। তবে গ্রামের তুলনায় শহরের অবস্থা অল্প পরিমাণে ভালো অর্থাৎ শহরের কিছুসংখ্যক মেয়েরা আজকাল অন্তঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে অন্তত যুগোচিত সময়ের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে ।

যে-কোনো একটি জাতি সুসভ্য বলে মান্যতা অর্জন করতে গেলে মহিলাদের মর্যাদা দান আবশ্যক। পুরুষের এবং নারীর উভয়ের পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সমঅধিকারের দ্বারাই জাতির উন্নতি সম্ভব।

মনু বলেছেন –

> "Where women are respected, there the gods delight; and where they are not, there all works and efforts come to naught."[১]

এই সময়ে অবস্থান করেও মেয়েরা পুরুষের অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। কোনো প্রাপ্তযৌবনা মেয়ে বাড়ির বাইরে বের হলে মা বাবা তার নিরাপত্তার জন্য তার সাথে ছোটভাইকে সাথী করে পাঠান। কিন্তু একবারও তাঁরা ভাবেন না যে দিদির যদি কোনো বিপদ আসে তা হলে সেই ছোট ভাইটি আদৌ দিদিকে রক্ষা করতে পারবে কি না; সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের এই অবস্থানকেই আমরা সাহিত্যের নানা পটে প্রতিফলিত হতে দেখেছি, বা বলা ভালো আমাদের সাহিত্যশাস্ত্রে ইতিহাসে সর্বত্রই মেয়েদের জন্য একটি আকল্প নির্দিষ্ট ছিল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবে নারী তার জন্য নির্দিষ্ট আকল্পকে তার নিয়তি বলে ধরে নিয়েছিল। এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও এই পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সুনির্দিষ্ট রয়েছে।

বিভিন্ন শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভাজন রেখা স্পষ্ট–নারী অবলা, বনিতা, নারী ঊনমানব, নারীদেহ কাম্য, উপভোগ্য মর্দিতব্য তাই সে কামিনী। মেয়েদের মা বাবা আশীর্বাদ করে বলেন সুপুত্রবতী হও, শতপুত্রের জননী হও, একবারও বলেন না সুকন্যাবতী হও শতকন্যার জননী হও। পুরুষের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, তা হল বলশালী, বলবান, বীর্যবান, বিক্রম ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষা যেহেতু চেতনার চিহ্নায়ক তাই সচেতন ভাবেই নারী হল পুরুষের চোখে দূরীভূত নেতিবাচক অপর। নারীকে অপর করে রাখছে এই পুরুষতন্ত্র বহুকাল ধরে। লৈঙ্গিক অপরতার মধ্য দিয়েই নারীর অভিজ্ঞানের সূচনা। পুরুষকে রাখা হচ্ছে কেন্দ্রে, আর কেন্দ্রের জগৎটা কেমন? আলোকিত উপনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু, আর নারীকে রাখা হচ্ছে ধোঁয়াশায় ঢাকা অর্ধস্ফুট দূরত্বের অবস্থানে। তার সমস্ত পরিচয় গড়ে উঠেছে লৈঙ্গিকভাবে চিহ্নায়িত হওয়ার পরে। পুরুষের আধিপত্যকামী মনোভাবের দ্বারা শোষিত হতে হতে নারী নিজেকে গুরুত্বহীন বলে ভাবতে শুরু করে এবং স্বাধীনতাহীনতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

শারীরিক বা শরীরবৃত্তির অর্থে লিঙ্গ-বিভাজন করা যায় না। মানুষের কাজের মধ্য দিয়েই তার আসল পরিচয় নির্ধারণ করতে হয়। লীনা চাওলা বলেছেন –

> "Gender is a social construction of the specific characteristics, norms and behaviours associated with being female or male in any specific social context. It is based on primarily two factors, genetic and social conditioning."[২]

নারী লতাগুল্মের মতো অর্থাৎ লতা যেমন শক্ত কোনো কিছুকে আকড়ে না ধরলে দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি পুরুষরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য করে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে। পুরুষতন্ত্র নারীকে 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' করে নির্মাণ করে আবার মনের মাধুরী দিয়ে নির্মান করে 'পূর্জঃহ গৃহদীপ্তয়ঃ' করে রাখে। নারীর বুদ্ধি অর্ধেকের বেশী দেখতেই পায় না এ সমাজ।

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাচীন কালে বেদপর্বে এবং বিভিন্ন সংহিতায় নারীকে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মনুসংহিতায় মনু নারী জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েদের দিন রাত্রির মধ্যে কখনও স্বাধীন থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না মনু। আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মে জীবনে পরমার্থ লাভের পথে

নারীকে প্রধান বাধা বলে মানা হত এবং এখনও এই ধারণার পরিবর্তন হয়নি। পুরুষের ব্রহ্মচর্য, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন ও মোক্ষ লাভের পথে নারীর সংসর্গকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে মানা হয়েছে। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেও নারীর প্রয়োজন কেবলমাত্র পুরুষের মুক্তির মাধ্যম হিসেবে দেখা হত সাধনসঙ্গিনীর ভূমিকায়।

জন গ্রের মতে পুরুষ মঙ্গলগ্রহ থেকে এবং নারী শুক্রগ্রহ থেকে জাত। তাঁর মতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-পার্থক্য তা লিঙ্গগত পার্থক্য নয় তা হল মানসিকতার ব্যবধান। জেম্‌স মিল বলেছেন –

> "Nothing can exceed the habitual contempt which the Hindus entertain for their women _ _ _ _ they are held accordingly in extreme degradation."[৩]

ভারতীয় মহাকাব্য, বিভিন্ন পুরাণেও নারী সম্বন্ধে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্মানজনক নয়। এর প্রমাণ আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে লক্ষ করি। বাল্মীকির সাত খন্ড রামায়ণের মূল কাহিনির প্রধান নারীচরিত্র যে সীতা, সেই সীতার অবস্থাও মোটেই সম্মানের ছিল না। পিতার আদেশ পালন করতে রাম লক্ষ্মণ সীতা ১৪ বছরের জন্য বনবাসে যান। সেখানে গোমতী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সীতাকে রাবণ হরণ করেন এবং কারণ দেখানো হল যে লক্ষ্মনের দেওয়া গন্ডি অতিক্রম করা। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক দেওয়া গন্ডি অতিক্রম করলেই নারীর বিপদ অনিবার্য। তারপর সীতা উদ্ধারের জন্য রাম লক্ষ্মণ সমুদ্র বাঁধলেন, লঙ্কায় গিয়ে সীতাকে উদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু সীতা উদ্ধারের পর রাম সীতার সাথে যেসকল জঘন্য আচরন করলেন, তা দেখে আমাদের মনে রামের অবতারত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। অবশ্য রামচন্দ্র তাঁর সীতা উদ্ধারের যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করতে কুন্ঠিত হননি, যে নিজের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতেই তিনি সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে রামোপাখ্যানে রাম কর্তৃক সীতার উদ্দেশ্যে যেসকল শব্দ ব্যবহার করেছেন তা ভাবলে রামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আর থাকে না অনেকটা নিচে নামিয়ে আনে। সীতা সম্পর্কে রাম বলেন –

> "তুমি সচ্চরিত্র হও বা দুশ্চরিত্রই হও, তোমাকে আজ আমি সম্ভোগের উৎসাহ পাচ্ছি না; সীতা তুমি হচ্ছ কুকুরে চাটা ঘিয়ের মত পরিত্যাজ্য।''[৪]

নিজ স্ত্রীর প্রতি রামের এই জঘন্য ভাষা ব্যবহার আমাদের কাছে অতীতের সমাজে নারীর অবস্থানকেই স্পষ্ট করে। সীতাকে অপহরণ করার পর রাবণও তো এতবড় অপমান করেননি। বরং রাবণ সীতাকে অশোকবনে রাক্ষসীদের পাহারায় বন্দি করে রেখেছিল। আমাদের ভারতীয় সমাজে রামের মতো আদর্শ পুরুষ নিজ স্ত্রীর সম্পর্কে এতবড় জঘন্য কথা উচ্চারণ করেও পুরুষোত্তমের অভিধা পেয়ে যান।

রাম উপাখ্যানে আরও আছে –

> " 'গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্য্যং তন্ময়া কৃতম'। মানে যাও সীতা তুমি মুক্ত, আমার যা করনীয় ছিল তা আমি করেছি। প্রাকৃত বাচনে যদি কথা গুলি রূপান্তরিত করা যায়, তা কি এরকম দাঁড়ায় না সীতা তুমি বিদায় হও, তুমি চুলোয় যাও কিংবা যেখানেই যাও তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার পুরুষালি অহংভাব যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই আমাকে লঙ্কায় রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত বড়োসড়ো ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। আমার কাজ আমি করে ফেলেছি, এবার তুমি পথ দেখতে পারো। এই নিষ্ঠুর ও নৃশংস ব্যাবহারের কি তুলনা আছে কোনো? স্ত্রীর মূল্য তাহলে স্বামীর কাছে কতটুকু! বস্তুত কল্পিত অপরাধে সন্দেহ প্রবন হয়ে, স্ত্রীর প্রতি চরম অবিচার করার রেওয়াজ ভারতীয় হিন্দু সমাজে রামই চালু করেছেন।''[৫]

এমন কি সীতাকে রাম সন্দেহ করে রাবন বিভীষণ, হনুমান এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হয় তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর সীতা লব কুশ দুই পুত্রসন্তান জন্ম দিলে তাদের পিতৃত্ব নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাই শেষ পর্যন্ত সীতাকে পাতালে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজই।

মহাভারতেও দেখি দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্য সভায় তাদের সামনেই তার আব্রু নাশ করে বস্ত্র হরণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপার আমাদের জাতীয় লজ্জা বলে আমরা মনে করি। আবার ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে তার স্ত্রী গান্ধারী সর্বদা চোখ ঢেকে রাখতেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে গান্ধারী নিজের ইচ্ছায় চোখ ঢেকে রাখতেন, না তার স্বামী পৃথিবীর আলো দেখতে পান না বলে তাকেও পৃথিবীর আলো দেখা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আমরা এখনও গর্ব করি অহল্যা, গার্গী, মৈত্রেয়ীকে নিয়ে কিন্তু প্রাচীনকালে কত সংখ্যক নারী এদের মতো ছিল।

বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান বুঝতে গেলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদগুলোতে শুধুমাত্র আমরা সমাজের প্রান্তিক মানুষদের পরিচয় পাই। এই চর্যাপদগুলো যেহেতু বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন সঙ্গীত তাই কায়া বা দেহ সাধনার প্রসঙ্গে নারীর কথা এসেছে যদিও তা রূপকের আশ্রয়ে বলা হয়। সমাজের নিচু তলার মানুষদের ভোগ করতে ব্রাহ্মণরা ডোম, শবরী নারীদের ঘরে রাতের বেলা চুপি চুপি যৌন সুখ লাভ করার আশায় ব্রাহ্মনাড়িয়ারা যেত। অর্থাৎ এই চর্যাপদেও আমরা নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবেই দেখতে পাই।

এরপর মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাষন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর হিন্দু সমাজ মেয়েদের অন্তঃপুরে বন্দি করে রাখলেন শুচিতা বজায় থাকার দোহাই দিয়ে। আদি মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র রাধাকে যৌন পুত্তলিকা হিসেবে ভোগ করেছেন একাধিকবার। ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, হারখন্ড, যমুনাখন্ডে কৃষ্ণ অনেক সময় বলপুর্বক রাধাকে ধর্ষন করতে পিচপা হন নি। কিন্তু যখনই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম ভাবের উদয় হয়েছে তখনই শ্রীকৃষ্ণ রাধার মনে শাশ্বত বিরহের আগুন জ্বালিয়ে মথুরায় চলে গেছে। বৃন্দাবন ছাড়ার পর কিন্তু কৃষ্ণ আর রাধার কাছে ফিরে আসেন নি।

মঙ্গলকাব্যগুলোর দিকে যদি তাকাই তাহলে লক্ষ করা যায় যে মঙ্গলকাব্যের বেশীর ভাগ দেবীকেই হিংস্রতার প্রতিমূর্তি হিসেবে অঙ্কন করেছেন মঙ্গলকাব্যের পুরুষ কবিরা। দেবী মনসার তো চোখটিই কানা করে দেওয়া হয়েছিল চন্ডীকে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধারকের দ্বারা। কত লড়াই করে পুরুষসংখ্যা বহুল দেবসমাজে মনসাকে স্থান

লাভ করতে হয়েছে। তাই মনসা আক্ষেপ করে বলেছেন 'যে ডালে আমি বসি সে ডালই ভেঙ্গে পড়ে'। চাঁদ সদাগর পুরুষদেবতা শিবের আরাধনা করেন বলে কিছুতেই মনসাকে পূজা করতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতেই হল বটে কিন্তু আমরা দেখলাম যে পুরুষ অতি সহজে নারীর কাছে মাথা নত করবে না। চাঁদ সদাগর আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভু। তার অহংকারের কাছে স্ত্রী সনকার আবেগের কোনো মূল্যই ছিল না।

মধ্যযুগের শেষ সাহিত্য নিদর্শন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে পার্বতীর উক্তি থেকে তৎকালীন সময়ের নারীপুরুষের চিত্র আমরা পাই-

"নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে ।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।
পুরুষেরা দেখে যদি নারী মরে যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা।।"[৬]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি শুধু যে উদাসীন ছিলেন তা নয়, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কেও বিশ্বাসহীনতা এমন কি পরনারীতে আশক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থানের আরও অবনতি হয়েছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ কৌলিন্য প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির কারনে নারীর অবস্থা আরো তীব্রতর ভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সমাজের উঁচু ঘরের মহিলাদের বাড়ীর ভিতরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি পরিবারে পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা ভালো মন্দের কোনো রূপ ধার ধারেনি পুরুষের সমাজ। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার দাপটে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনঃরুত্থানের সময় পর্বে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রকোপ পড়ল সরাসরি মেয়েদের ওপর। কুলীন পিতা কুল ধর্ম রক্ষার

তাগিদে ৫-৬ বছরের কন্যা কে মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিতে একটুকুও কুন্ঠাবোধ করত না। যে মেয়েটি খেলার নেশায় ছুটত, হয়তবা তার মুখ থেকে দুধের গন্ধ তখনও যায় নি এ বয়সের একটি মেয়ে বিয়ে কি তা কীভাবে অনুধাবন করতে পারে? কিন্তু মেয়েদের বোঝা না বোঝার ব্যাপারে পুরুষের কিছু যায় আসে না। সেই মেয়েটি হয়তো বৎসরে একবার স্বামীর মুখ দেখতে পেত না কারণ তার স্বামী তো আর একটি বিয়ে করেননি, সে তো এরকম অনেক অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ের স্বামী। কমল কুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে এই ভয়াবহ অবস্থার চিত্র আমরা পাই। হঠাৎ করে বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর জ্বলন্ত চিতায় ফুল ফোটার আগেই এই বঙ্গদেশে কত নাম না জানা মেয়ের জীবনের কলি স্বামীর চিতায় জ্বলন্ত অবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই সময় এমনই ভয়াবহ ছিল যে বাল্য বিবাহের ফলে কোলের শিশু পর্যন্ত বাগদত্তা হয়ে যেত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' বিষয়ক পুস্তিকাতে গ্রন্থে যে বিবাহের তালিকা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মন তার ৫৫ বৎসর বয়সে ৮০টি বিবাহ করেছিলেন।

১৭৬০এ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে পরাজিত হলেন। বাংলার ভাগ্যাকাশে ইংরেজ শক্তির প্রবেশ ঘটল। কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনটি গ্রাম মিলে কলকাতা নগরীর পত্তন সূচিত হয়। এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত ধরেই এই পত্তন হয়। নতুন এই রাজ শক্তি ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা দিয়ে শুরু করল সাম্রাজ্যবিস্তার এবং ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষেই তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলল এবং কলকাতা নগরী কলকল্লোলিনী শক্তি হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠল।

বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শুরু হয়ে গেল এক নতুন ঢেউ এবং এই ঢেউ আছড়ে পরল সমাজের নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে নানা রঙ্গেঁ। সুচতুর ইংরেজদের বনিকের মানদন্ড যখনই রাজদন্ড হিসেবে দেখা দিল তখনই শুরু হল নানাবিধ আলোড়ন। যে কোনো দেশে যখন নতুন কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটে সেই শক্তি নিজেদের জায়গা শক্ত করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করে এবং সেই কৌশলের অঙ্গ হিসেবেই বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার আসে।

একদিকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড অন্যদিকে খ্রিষ্টান পাদরিরা ধর্ম প্রচারের জন্য ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত করলেন। স্থাপন করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে, এই সালেই তৈরি হল শ্রীরামপুর মিশন। ইংরেজরা ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার চালু করলেন। এর উদ্দেশ্য হল প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য কিছু ইংরেজী শিক্ষিত কেরানী তৈরি করা। তবে প্রতিটি জিনিষের ভালো মন্দ দিক থাকে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে কলকাতা শহরে বেশ কিছু ইংরেজী শিক্ষিত যুবক তৈরি হল এবং এদের হাত ধরেই আমাদের ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে মধ্যযুগীয় অপসংস্কার ও কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হল। যারা সমাজ সংস্কারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, দয়ানন্দ সরস্বতী।

রাজা রামমোহন রায় প্রথম সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করলেন। তিনি সতীদাহের মত এতবড় জঘন্য কর্মের জন্য গভীর ভাবে দুঃখিত ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন পুরান গ্রন্থ উপনিষদ থেকে প্রমান সংগ্রহ করে হিন্দু ধর্মের কূলপ্রদীপদের চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এই প্রথা ধর্ম বিরুদ্ধ প্রথা। বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, গোস্বামীর সহিত বিচার, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার এই সব বিতর্ক মূলক রচনাগুলি লিখে তিনি সতীদাহ এবং বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সালে লর্ডবেটিঙ্ক এর সহায়তায় আইনের সাহায্যে সতীদাহের মত কুপ্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন।

উনিশ শতকটাই ছিল একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বময় সময়। একটা ভাঙাগড়ার সময়। একদিকে প্রগতিশীল সমাজ আর একদিকে রক্ষনশীল সমাজ। একদিকে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার আবার অন্যদিকে পুরানো ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, আবার ব্রিটিশকে অনুকরন করতে গিয়ে যুবকদের মদ্যপান, বারাঙ্গনা বিলাসিতা, পায়রা ওড়ানো, গো মাংস ভক্ষন ইত্যাদির আস্ফালনও বৃদ্ধি পায়। যেহেতু সমাজটা দ্বন্দ্বময় একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল তাই সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপিত হল। এই কালপর্বে মেয়েরাও যে মানুষ তাদেরও যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা কিছু সংখ্যক শিক্ষিত

মানুষ অনুধাবন করলেন, কিন্তু চিরকালীন সংস্কার লালিত কিছু সংখ্যক মানুষ তা আবার মানতে পারলেন না। এর একটি বড় প্রমান ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা –

"আগে মেয়ে গুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে।"[৭]

এটি ঈশ্বরগুপ্তের দোষ নয় ঐ সময়টাই ছিল একটা ভাঙাগড়ার দ্বিধাদ্বন্দ্বময় সময়।

সতীদাহ প্রথা নিবারন হওয়ার পর স্বভাবিক ভাবেই প্রচুর পরিমানে বাল বিধবার সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পেল, কিন্তু বিধবাদের আবার বিয়ে নিষিদ্ধ বা বিধবাদের বিয়ে করতে রাজী হয় না আমাদের সমাজ, এরকম একটি ভয়াবহ জলন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল শাসকের অনুমোদনে।

স্ত্রীশিক্ষা বা নারী শিক্ষা বিষয়টি একেবারে নতুন কোনো বিষয় নয়। যদিও ভারতীয় নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে খুব গৌরব করার মত কিছু ছিল না। ঊনিশ শতকের আগে নারীর জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তা নিছক ধর্মীয় মোড়কে আবদ্ধ। শিক্ষা মানুষের মধ্যে থাকা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায় এবং সেই পরিপুর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষের মধ্যে আসে চেতনা। উনিশ শতকীয় পূর্ববর্তী কালপর্বে আমাদের দেশে যেটুকু নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল সে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীর অর্ন্তনিহিত জ্ঞানশক্তির বিকাশের জন্য কোনো পরিধিই ছিল না। উনিশ শতকে নতুন চিন্তাচেতনা বিকাশ ও অগ্রগতির সূত্র ধরেই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় চালু হল। স্ত্রীশিক্ষা কোনও নতুন বস্তু নয়, কারন ঊনবিংশ শতকের আগে যে মেয়েরা লেখাপড়া করত না তা কিন্তু নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই নারীদের শিক্ষার আলো ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নেতারা অনুধাবন করেছিলেন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নারীরও সমান অংশীদারিত্ব আবশ্যক। সমাজ ব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষের যৌথ সহাবস্থান কাম্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই নারীর জাগরন ও অগ্রগতি সম্ভব। এই লক্ষ্যে কলকাতা নগরীতে নারীদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ খোলা হল। ঠাকুর বাড়ীতেও ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষা দানের লক্ষ্যে

বৈষ্ণবী দিয়ে শিক্ষা দান করা হত। এছাড়াও কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার হার বাড়ছে দেখে অনেকেই তার বিরোধিতা করেছিলেন। একদলের আপত্তি ছিল যে স্ত্রীশিক্ষার কারণে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তখন স্ত্রীশক্ষা ছিল একটি নিন্দার ব্যাপার। তখনকার দিনে সংসারধর্ম সুন্দর ও সুষ্ট ভাবে পালন করতে পারলে তবেই হত প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপার প্রথম এসেছিল পশ্চিমি সভ্যতা থেকে তাই পশ্চিমি সভ্যতাকেই দোষ দেওয়া হয় স্ত্রীশিক্ষার জন্য। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল যে রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গেরই আপত্তি ছিল তা কিন্তু নয়, যারা স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করতেন তারাই আবার শিক্ষিত মেয়েদের আচার আচরনে ত্রুটি খোঁজে পেতেন। এই ছিল মোটামোটিভাবে উনিশ শতকের সমাজ চিত্র।

এখন আমরা উনিশ শতকের বাংলার নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাইব। সাম্প্রতিক কালে যে বিষয়টি নিয়ে বহুল এবং ব্যাপক পরিমানে আলোচনা চলছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি তার মধ্যে অন্যতম। নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার, নারীমুক্তি ও নারী উন্নয়ন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার লক্ষে ক্ষমতায়ন (Empowerment) পদ্ধতি বর্তমান সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। মূলত তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী লেখিকা এবং নারী কর্মীদের দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর পিছিয়ে পড়া শোষিত হওয়া নারী সমাজের মুক্তি ও উন্নয়নের লক্ষে এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করতে গেলে তাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক। ক্ষমতাহীন নারী সমাজকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমেই কেবল নারী পুরুষ সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ভারতীয় উপমহাদেশে পারিবারিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারীপুরুষের ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। এর জন্যই নারীর মুক্তি নারীর উন্নয়ন ও সমাজের সার্বিক কল্যান অর্জিত হচ্ছে না। একটি পাখী যখন আকাশ বিচরন করে তখন তার দুটো ডানারই প্রয়োজন হয়। তার যদি একটি ডানা কেটে দেওয়া হয় তবে তার দ্বারা আকাশে বিচরন সম্ভব নয়। তেমনি নারী পুরুষের উভয়ের যৌথ সমতাভিত্তিক অংশদারিত্বের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠ উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

সাম্প্রতিক কালপর্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রবেশ পথ (Approach) হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তাত্ত্বিকদের দ্বারা ক্ষমতায়ন ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রন মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতাই ক্ষমতায়ন ধারনার মূল বিষয়। ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। পিতৃতন্ত্রের পরাক্রম থেকে বেরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্টিত করতে পারাটাই নারীর ক্ষমতায়ন।

স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন জাগে যে ক্ষমতায়ন, কিসের ক্ষমতায়ন। মোঃ আব্দুল মান্নান এবং সামসুন্নাহার খানম মেরী বলেছেন-

> "ক্ষমতায়ন হল বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা। এই সম্পদকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে : বস্তুগত সম্পদের মধ্যে পরে ভূমি, বন, জল, মানবিক সম্পদের মধ্যে মানুষ এবং তার শরীর, শ্রম, দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের আওতায় আসে জ্ঞান, তথ্য এবং তথ্যের উপর ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ধারনা। আর্থিক সম্পদের আওতায় আসে অর্থ আর সামাজিক সম্পদ বলতে সামাজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, পারিবারিক সর্বজনের প্রতি আস্থা। এসব সম্পদের উপর ভিত্তি করেই, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা দ্বারাই ক্ষমতায়নের মাত্রা নির্ধারিত হয়। কেবল মাত্র আর্থিক স্বাবলম্বিতা নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রন মুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা তৈরি করে নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোই ক্ষমতায়ন"।[৮]

The United Nations Development Programme (UNDP) এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী জেন্ডার ক্ষমতায়ন কে তিনটি ভাগে পরিমাপ করা যায়। এই তিনটি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও পেশাগত। নারী কতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছে তা পরিমাপ করতে হলে দেখতে হবে সে কতটা অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে।

ক্যারলিন মোসার ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরকম ভাবে –

> "The capacity of women to increase their own self-reliance and internal strength. This is identified as the right determines choices in life and to influence the direction of change through the ability to gain control over crucial material and non-material resources."[৯]

ঐতিহ্যগত ভাবেই আমাদের দেশের নারীরা বিভিন্ন ধরনের শোষণ নিপীড়ন এর শিকার। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে এদেশের কিছু সাহসী মহিলার সক্রিয় অংশ গ্রহনের গৌরব আছে। প্রাচীন ও বৈদিক কালে গার্গি, খনা, মৈত্রেয়ী, অহল্যার কথা আমরা জানি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আমরা সুলতানা রাজিয়ার মতো বীর বিক্রমী নারীর কথাও পাই। ব্রিটিশ আমলে নারীর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কিন্তু আজ একবিংশ শতকেও সমাজের সর্বস্তরের নারী ক্ষমতার স্বাদ পায় নি।

ভারতীয় উপমহাদেশে অধিকাংশ মানুষই বসবাস করে গ্রামে এবং এদের মধ্যে অর্ধেকই নারী। এই অর্ধেক জনসংখ্যার বেশীর ভাগ নারী অবহেলিত ও নির্যাতিত। ভারতবর্ষে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের কারণেই তারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী পশ্চাৎপদ যাত্রী।

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। নারীকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখা হয় না। ভারতবর্ষে এবং আমাদের বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে ঘরের লক্ষ্মী, নারী ঘরের শোভা, নারী হবে নরম কোমল সহনশীল ও পতিব্রতা এ ধরণের একপেশে ধারণার বশবর্তী করে দেখা হয়। নারীর ইচ্ছা তার স্বামী বা পরিবারের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হবে, নারী যত বড় চাকুরীজীবি হোক না কেন নারীর মূল কাজ হবে গৃহে, স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর স্বর্গ।

অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে বলেছেন–

> "সর্বত্র পৌরুষের বন্দনা লক্ষ করি কেননা পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব সমার্থক। জৈবিক নিরিখে যদিও পুরুষ ও নারীর জন্মদাত্রী, মনন বিশ্বে কিন্তু পুরুষই স্রষ্টা-তারই ইচ্ছায় ও প্রয়োজনে নারীর, আসলে নারী বিষয়ক ধারনার, সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হয়ে চলেছে। নারীর জগৎ, নারীর ভাবনা, নারীর ভাষা-সব কিছুতেই পুরুষের সৃষ্টি চাতুর্য ব্যক্ত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নারীর সম্ভাব্য চেতনা ও সংবেদনাকে নিঃশেষে মুছে ফেলে লিঙ্গ রাজনীতি আপন দখলদারির ধ্বজদন্ড পুঁতে দিয়েছে সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে। নারীর জীবনযাপনেই যে পুরুষ-প্রভু কর্তৃক নিষ্কন্টক করে রেখেছে, তা-ই নয়; তার ইহকাল-পরকাল স্বপ্ন কল্পনা বিশ্বাস-আকাঙ্খা শরীর-মন : সর্বত্র পিতৃতন্ত্রের কর্তৃত্ব নির্বাধ ও দৃঢ় প্রতিষ্টিত।"[১০]

নারীচেতনাবাদী আরশিতেই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি উঠে আসে। আধুনিক সময়পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞান হল নারীচেতনাবাদী অভিজ্ঞান। পুরুষ সর্বস্ব পৃথিবীতে নারী তার আপন স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে আধুনিক কালপর্বেই। এই স্তরে আসার আগে নারীকে অনেক চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, যে পথ ছিল কুয়াশা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে বলেছেন–

> "আপন জৈবিক স্বাতন্ত্র্যের বোধ থেকে আস্তিত্বিক স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিতে উত্তরণের পথে নারীকে অজস্র চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যেতে হয়েছে। নারী তার আপন জগৎ গড়ে নিতে পারে নি। বিপুল প্রতিকূলতা ও আত্মবিরোধ অতিক্রম করে বহুমাত্রিক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নারীচেতনা ও নারীবিশ্ব নিজস্ব অস্তিত্ব ঘোষনা করেছে।"[১১]

পাশ্চাত্যে গত দুই শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা পর্যায়ে নানা ধরনের আন্দোলন মেয়েদের সংগঠিত করতে হয়েছে। কোনো সময় শিক্ষার, কোনো সময় সম্পত্তির কোনো সময় ভোটের অধিকারের লক্ষ্যে তাদের সক্রিয়

হতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ নারী অথবা তৃতীয় বিশ্বের নারী সমাজের স্বতন্ত্র সংগ্রামের আয়োজনও। নারীচেতনাবাদী পাঠ পুরুষকে ঘৃনা করার কথা কখনও বলে না বরং পিতৃতন্ত্রের দেওয়া যুক্তি শৃঙ্খলাকেই নারীচেতনা গত এক শতাব্দী ধরে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। শোষণের জ্বালা সহ্য করতে করতে যখন পিছনে আর সরার জায়গা নেই অর্থাত পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে গেছে তখন থেকেই নারীর প্রতিবাদ সূচিত হয়, এবং তখন থেকেই নারীচেতনার সূত্রপাত। নারীচেতনাবাদীদের সাংস্কৃতিক রাজনীতি কেবলমাত্র লৈঙ্গিক বা জেন্ডারগত প্রভুত্বকেই প্রত্যাখ্যান করে না প্রতিবাদ ও প্রত্যাহ্বানের নতুন নতুন ধরনও খুঁজে নেয়। নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক বহুবাচনিক প্রতিবেদনগুলিতে উদারনীতি মার্কসবাদ, নিম্নবর্গীয়চেতনা উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ অনেক ক্ষেত্রে জড়িত। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু মাত্র ক্ষমতা দখলের মদমত্ততার প্রত্যাশা করে না বরং মেরেরা স্রষ্টা-ব্যক্তিত্ব শিল্পী, লেখক ও সমালোচক হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

উনিশ শতকের নারীর ক্ষমতায়নের ধরন আজকের একবিংশ শতকের নারীর ক্ষমতায়নের ধরনের মতো ছিল না। আজকের নারীরা যতটা স্বাবলম্বী যতটা স্বাধীন ভাবে সমাজের বুকে বিচরণ করছে, উনিশ শতকের সমাজ পরিসর নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে জোর করে স্তিমিত করে রাখার প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারই নারীর বাঁধন ধীরে ধীরে খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। অষ্টাদশ শতকের নারীরা যতটা পরিমানে অবরোধবাসিনী ছিল তা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। নারী তার আপন ভাগ্য জয় করার প্রচেষ্টা নিজেই শুরু করেছিল। এ ক্ষেত্রে উদারপন্থী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবরোধবাসিনী নারী আপন পরিসর খোঁজার প্রচেষ্টা করেছিল উনিশ শতকে। লেখাপড়া করার সূত্রে উনিশ শতকীয় নারী গোপনে ও বেনামে লেখালেখি শুরু করে দিয়েছিল। রাসসুন্দরী দাসী, বিনোদিনী দেবী, সরলা দেবীর মতো নারীরা পুরুষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কলম ধরেছিলেন। এবং আজকের নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এরাই ছিলেন পথ প্রদর্শক।

উনিশ শতকের নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার আদিমাতৃকা হিসেবে রাসসুন্দরী দাসী, বিনোদিনী দাসী, মানদা দেবী, বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের কথা আলোচনা করা অতি আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথা প্রায় শোনা যায় যে তিনি নারীবিবাদী। কারণ হিসেবে বলা হয় যে তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্র অঙ্কন করলেও নারীদের একটি পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের দ্বারা নির্মাণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা চরিত্র সম্পূর্ন পুরুষতন্ত্র দ্বারা গ্রস্থ চরিত্র। এই উপন্যাসেই বঙ্কিম আয়েষাকে দিয়ে যতই বলিয়ে থাকুন না কেন 'এই বন্দী আমার প্রানেশ্বর' কিন্তু তবুও তাঁর সচেতন বা অবচেতনে তা পুরুষতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। রোহিনী, কুন্দনন্দিনী, আয়েষা, তিলোত্তমা নারী চরিত্রগুলির দিকে লক্ষ করলে আমরা বঙ্কিমের নারী ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান আমরা করতে পারি।

বঙ্কিম পরবর্তী সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ। নারীকে নিয়ে রবীন্দ্র ভাবনা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি কখনো বলেছেন নারী অর্ধেক কল্পনা, আবার কখনো বলেছেন আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে এবং ভালবাসা দিয়ে মানস প্রতিমা গড়ে তোলার কথা। নারী কখনো তাঁর কল্পনা আবার কখনো মানস প্রতিমা। এই রবীন্দ্রনাথই ল্যাবরেটরী ছোটগল্পে 'মোহিনীর' মতো নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আবার 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন-

'পূজা করে রাখিবে উর্দ্ধে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীকে নিয়ে যদিও বিস্তর লেখালেখি করেছেন। তিনি গ্রাম বাংলা ঘুরে ঘুরে বহু নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সত্যি, কিন্তু তাঁর নারী চরিত্রগুলিকে

তিনি কোমল মতি, সুগৃহিনী, ভালবৌদিদি করেই রেখেছেন। কেবল মাত্র পল্লীসমাজ উপন্যাসে রমা চরিত্রের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়।

তাই বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশীর ভাগ মহিলাই ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন লেখা পড়া বর্জিত। যাঁরা নিজের চেষ্টায় বা স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছিলেন তারাও বই লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। শিখেছিলেন নিজের মনের অন্তর্নিহিত এক তাড়নাতে। মানুষের জীবনই তো হল অভিজ্ঞতার ভান্ডার, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আলো অন্ধকার, আশা নিরাশার এক একটি উপাখ্যান। উনিশ শতকে যে সব বাঙালি মহিলা নিজের আত্মকথা লিখে গিয়েছিলেন 'রাসসুন্দরী দাসী' তাদের মধে অন্যতম, তাঁর সময়কাল ছিল ১৮০৯-১৯০০। তাঁর 'আমার জীবন' আত্মজীবনী মূলক একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে উনিশ শতকের মহিলা নারীর এক বিরাট ইতিহাস আমরা পাই। এগুলি সমাজিক ইতিহাসের এক একটি মহা দলিল। রাসসুন্দরীর বাসনা ছিল লেখাপড়া শিখে পুঁথি পড়বেন। এই বইখানির গুরুত্ব কতখানি তা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন-

> "এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।"[১২]

ঠাকুর পরিবারের একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির চোখে এক নারীর আত্ম মান্থনের প্রতিবেদন কে শুধু 'উপাদেয়' মনে হয়েছিল কেননা এক পুরুষের দৃষ্টিই এতে পড়েছিল এর ভেতরের যন্ত্রনার কথনকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

উনিশ শতকের আরো একজন উল্লেখযোগ্য নারী হলেন বিনোদিনী দাসী(১৮৬৩-১৯৪১) তাঁর 'আমার কথা' গ্রন্থে উনিশ শতকের এবং তারও পূর্বের নারীর প্রকৃত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বহুপরিমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পঙ্কিল আচরণ, কদর্য মনোভাব এবং এক গাঢ় অন্ধকার ময় কুটিল চরিত্রের আনাগোনা। প্রায় সমগ্র জীবন রঙ্গমঞ্চের সাথে নিজেকে ব্যপৃত রেখেছিলেন বিনোদিনী দেবী। তৎকালীন সমাজ কতৃক শুধুমাত্র নিন্দা ঘৃণাই হজম করেছিলেন একমাত্র নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও পরম প্রেমময় ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন

'তোমার চৈতন্য হোক'। বাংলা রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনাদের অভিনয়কে কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী সমর্থন করতে পারেননি। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন-

> "বিদ্যাসাগর যিনি সারাজীবন স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রানপাত করলেন তিনিই মেয়েদের মঞ্চে আনার প্রতিবাদে মঞ্চের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।"[১৩]

নিজের সম্পর্কে বিনোদিনীর অকপট সম্বোধন ভাগ্যহীনা বারনারী, ঘৃনিতা বারনারী, ঘৃনিতা সমাজ বর্জ্জিতা বারবনিতা।

তার আনেক পরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপণ্যাসে সুবর্ণলতা, বকুল, পারুলদের মধ্যে নারীর আপন স্বতন্ত্র ও অস্তিত্ব অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। রাসসুন্দরী দাসী, বিনোদিনী দেবী, অনুরুপা দেবী নারী ভাবনার আদি মাতৃকা। তাঁরা পথ তৈরি করেছিলেন বলেই আজ আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন, তসলিমা নাসরিন, সেলিনা হোসেন, মালেকা বেগমের মতো লেখিকারা কলম ধরতে পেরেছিলেন।

মানদাদেবীও উনিশ শতকের একজন লেখিকা। তাঁর লেখা 'একজন গৃহবধুর ডায়েরী' গ্রন্থেও তাঁর নিজের জীবনের স্মৃতিকথা শুধু স্মৃতি কথা নয়, তৎকালীন সময়ের দলিল।

বাঙালির জাগরনের এবং বাঙালি নারীজাতির মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন যিনি ছিলেন প্রথম চেতনা সম্পন্ন একজন নারী। নারীমুক্তির ইতিহাসে তিনি একজন প্রগতিশীল চিন্তার অগ্রদূত। তাঁর একটি চিঠি থেকে তাঁর জীবন কাহিনি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি–

> "শৈশবে বাপের আদর পাই নি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ ইউরিন পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেধেঁছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলাম, তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে

> পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুরছি।"[১৪]

রোকেয়ার বিশ্বাস ছিল নারীশিক্ষাই নারী মুক্তির একমাত্র পথ এবং শিক্ষার দ্বারাই নারীর চিন্তা চেতনা প্রষ্ফুটিত হবে। সমগ্র জীবন ধরেই নারী মুক্তি নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গেছেন। সেলিনা হোসেন বলেছেন-

> "বেগম রোকেয়া উন্নয়ন বলতে বুঝেছিলেন নারীপুরুষের সামগ্রিক উন্নয়ন। পিছিয়ে থাকা নারীসমাজকে জেগে উঠতে বলেছেন। এক কাতারে আসতে বলেছেন। তিনি উন্নয়ন ব্যবস্থার সামগ্রিক বোধটিকেও দেখেছিলেন জনগোষ্ঠীর মানসলোকের আলোকে।"[১৫]

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সেলিনা হোসেনের মতে-

> "ক্ষমতায়ন নারীপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন অর্জনের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ জীবন ব্যক্তি কীভাবে নিয়ন্ত্রন করবে তা ঠিক করা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর হয়। এভাবে একজন নারী বা পুরুষ যখন জীবন জিজ্ঞাসার মতামত গ্রহনে ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন মনে করা হয় ক্ষমতায়ন হয়েছে।"[১৬]

১৮৬৩ সালে যখন 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হল তখন নারীচিত্তের বিকাশ পথ দ্রুততর হল। ১৮৫৭ সালে মহিলাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন নারীদের স্বাধীনতা নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তার ঠিক দুই বৎসর পর রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লিখলেন। তা থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই নারী বিকাশের আর বেশী দেরী নয়।

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী। প্রায় অশিক্ষিত এই মহিলা তাঁর জীবনের চরম ব্যস্ততা সম্পর্কে আমাদের জানান যে 'লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার সেই দশা ঘটিয়াছে।

আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই'। যে মহিলা নিজের জীবনের বিরম্বনার উল্লেখ করেছেন, সে মহিলাই কিন্তু আবার আত্মজীবনী প্রকাশের মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের মুখোস খুলে দেওয়ার মত ক্ষমতা অর্জন করেতে পেরেছেন।

নারী প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও আশ্চর্যজনক ভাবে বেদনায় বিভোর হয়ে তাকে অনেক সময় সত্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। নারী বুঝে নিয়েছিল যে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি কোনো সংগ্রাম ঘটানো না যায় তাহলে নারী তার ঠিক জায়গা দখল করতে পারবে না। সুলেখা সান্যালের বোন সুজাতা সান্যালের জবানীতে আমরা জানতে পারি ১৯২৮সালে বাংলাদেশে ফরিদপুরের এক রক্ষণশীল পরিবারে সুলেখা সান্যালের জন্ম হয়। কিন্তু একটি রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নিয়ে তাঁর জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে তিনি একজন প্রতিবাদী মহিলা হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে আমরা নারীসত্তার বিকাশ দেখতে পাই। তাঁর জীবনচর্যায়, সাহিত্যকর্মে, জীবন সংগ্রামে সকল ক্ষেত্রেই আমরা মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখতে পাই।

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বর্তমান সময়ের নারীর অবস্থানের দিকে একটু অবলোকন করব। আজকাল নারীর সচ্ছন্দ বিচরন দেখে অনেকেই বলেন যে আর কত নারী নিয়ে আলোচনা, নারীরা কোথায় আর পিছিয়ে, শাষন ক্ষমতা, উচ্চ শিক্ষা, প্রযুক্তি বিদ্যা, সামরিক বাহিনী সকল ক্ষেত্রেই তো নারীরা আর পিছিয়ে নেই। কিন্তু এখানেই সমস্যা আমরা যদি এর পরিসংখ্যান তৈরী করি তাহলে দেখতে পাই যে মেয়েদের নিয়ে এত লেখালেখি হওয়ার পরও নারীর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু নারীপুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে কিন্তু এখনও কোন সচেতনতা দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন মেয়েদের চোখের জল ফেলার দিন শেষ। আর যারা এই কথা মনে পোষন করতে পেরেছিলেন তারাই হয়ে উঠেছিলেন 'মর্মবানীর সার্থক শরীরী প্রতিমা'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে যদিও নানা বাদবিতন্ডা গড়ে উঠেছিল, তবুও একটি কথা অস্বীকার করা যায় না যে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নারীর নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার পথ সুগম হয়েছিল। তবে আমাদের দেশের নারীর এখনও

বিস্তর পথ হাটতে হবে, পুরোপুরি ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে মানসিক ভাবে আরও শক্তি শালী হতে হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রথম অধ্যায়

তথ্যসুত্র

1. Swami Abhedananda, *India and Her People*; A study in the Social, Political, Educational, Cultural and Religious condition of India, Ramkrishna Vadanta Math. Culcutta 2000. p. 143.
2. Leena Chawla Rajan, *Empower women, An Awakening* Radha Swami Satsang Beas, Beas, 2010, p. 11.
3. James Mill, The History of British India, Chelsea House, New York 1968. Pp. 309-310.
4. নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে, তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২-১৩।
5. ঐ পৃষ্ঠা ১৩।
6. অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, স্ত্রী, মন্দিরা সেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২-৩।
7. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০১।
8. নারী ও রাজনীতি, সম্পাদক, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান সামসুন্নাহার খানম মেরী, পৃষ্ঠা ১৫৬।

9. নারী ও রাজনীতি, সম্পাদক, অধ্যাপক মোঃ আব্‌দুল মান্‌নান সামসুন্নাহার খানম মেরী, পৃষ্ঠা ১৫৭।
10. নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে, তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৫।
11. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫।
12. রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন, বারিদ বরন ঘোষ, সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রস্থাবনা অংশ।
13. আত্মজীবনীর স্থাপত্য, দূর্বা দেব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৯।
14. ঐ পৃষ্ঠা ৮১।
15. পথ চলাতেই আনন্দ, সেলিনা হোসেন, পৃষ্ঠা ২৭।
16. ঐ পৃষ্ঠা ২৬।

****